তাম্বূল বণিক্।

তাম্বূল বণিক্

বা

বঙ্গীয় তাম্বূলী বৈশ্যজাতির ইতিহাস।

জাতিতত্ত্ব

ও

সৎশূদ্রের বৈশ্যত্ব বিষয়ক প্রস্তাব

সম্বলিত।

শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত সম্পাদিত।

এবাঞ্চ ক্রিয়ালোপাদ্বৈশ্যানামপি তথা।
(বৃষলত্বংগতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ)

শুদ্ধিতত্ত্ব।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানি প্রজায়তে॥

বৃহস্পতিঃ।
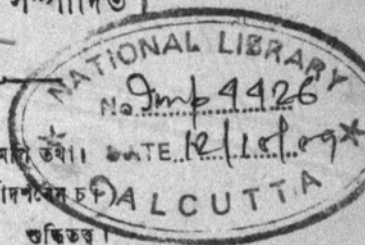
তাম্বূলী কুলরত্ন

শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র দে বি, এল,

ও

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন বি, এ,

মহাশয়দ্বয়কে

এই গ্রন্থ

উপহার স্বরূপ

উৎসর্গ

করিলাম।

বিজ্ঞপ্তি।

১৩০৪ বঙ্গাব্দে নব্যভারতে "বাঙ্গালী বৈশ্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩০৮ অব্দের আশ্বিন মাসে মহাজন বন্ধুর অতিরিক্ত সংখ্যায় "তাম্বূলীকুলের সম্বন্ধ নির্ণয়" নামে অন্য একটি প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। এতদুভয় অবলম্বনে বর্ত্তমান পুস্তক সঙ্কলিত হইল। এতৎ সম্পাদন কল্পে আমি অনেকের নিকট সাহায্য পাইয়াছি। স্থল বিশেষে তাঁহারা কি লিখিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিবার অবসর পাই নাই। এজন্য আমার কর্ত্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি হইয়াছে। বাঙ্গালী বৈশ্য পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার সময়, আশা করিয়াছিলাম, কোন উপযুক্ত লেখক বিস্তৃতভাবে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করিবেন; এ পর্য্যন্ত কাহাকেও উদ্যোগী না না দেখিয়া শারীরিক অপটুতা সত্ত্বে পুনর্ব্বার আমাকে অগ্রসর হইতে হইল। আমার উক্তি অন্যের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়া রচনা কার্য্য সমাধা হইয়াছে। তাম্বূলী সভার প্রথম অধিবেশনের দিন রাজকীয় জাতিতত্ত্ব নির্ণায়ক কার্য্যালয়ে প্রদত্ত ইংরাজী অনুবাদ সমেত তাম্বূলীকুলের সম্বন্ধ নির্ণয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ "বঙ্গীয় তাম্বূলী বৈশ্য" নামে প্রচারিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ তাহার পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। সৎশূদ্রের অন্তর্গত বৈশ্যশাখায় অপর জাতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি, অতএব জাতিতত্ত্ব অনুসন্ধানকারী পাঠকমাত্রকে অনুরোধ করিতেছি, কৃপা করিয়া পুস্তক খানি পাঠ করিবেন।

কাশীধাম।
ফল্গূৎসব।
সম্বৎ ১৯৫৯

শ্রীদুর্গাচরণ ভুতি।

সূচী।

উপক্রমণিকা।

সম্বন্ধ-নির্ণয়।

বর্দ্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী সমাজ।

বৈঁচির ১৪ গ্রামী সমাজ।

দুবরাজপুরের পল্লী ৪২ গ্রাম সমাজ।

বনকাটি "গোয়ালপেড়ে" অষ্টগ্রামী সমাজ।

কোতরাপুরের উৎকল অষ্ট-গ্রামী সমাজ।

খড়্গপুরের "সংসেরে" ৪২ গ্রামী সমাজ।

সমাজ ভেদ।

বিবাহ পদ্ধতি।

বৈশ্যত্বের আলোচনা।

পরিশিষ্ট।

বঙ্গীয়

তাম্বূলী বৈশ্য।

উপক্রমণিকা।

জগতে কোন জাতীয় জীব বা উদ্ভিদ্ এক রূপ থাকে না। সকলেই কাল সহকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এ পরিবর্ত্তন আন্তরিক, কেবল বাহ্যিক নহে। ইহাতে শুদ্ধ গুণান্তরাধান হয় এমন নহে, ইহাতে প্রকৃতিগত প্রভেদও জন্মে। এই পরিবর্ত্তনবশে এক জাতীয় জীব বা উদ্ভিদ্ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ অন্য এক জাতীয় জীবের বা উদ্ভিদের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। ভূতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায়, যে অগ্রে এই পৃথিবীতে উদ্ভিদ্ ও জীবের কতিপয় জাতি মাত্র বিদ্যমান ছিল, পরে অসীম কাল সহকারে তাহা হইতে অসংখ্য জাতীয় উদ্ভিদ্ ও জীবের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া সর্ব্বশেষে মানবের উৎপত্তি হইয়াছে। ভূপঞ্জরের নিম্নতর স্তরে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক জীবের ও উদ্ভিদের চিহ্ন পাওয়া যায়, কিন্তু যত উর্দ্ধস্থিত স্তরে উঠা যায়, তত অধিক সংখ্যক জাতির উপলব্ধি হইতে থাকে। ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন স্তর ভিন্ন ভিন্ন যুগে সংঘটিত হইয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বতন কালে অল্প সংখ্যক জাতি বিদ্যমান ছিল; অধুনাতনকালে ক্রমশঃ অধিকতর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এই যে ক্রমশঃ অধিকতর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা কখনই শূন্য হইতে প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতি হইতেই উত্তরোত্তর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। যে প্রক্রিয়া দ্বারা এক জাতি হইতে অন্য জাতির এরূপে প্রাদুর্ভাব হয়, অথবা সৃষ্টি-পারম্পর্য্য বিধৃত থাকে, তাহাকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন অথবা যোগ্যতরের সংরক্ষণ বলে। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে যাহা সারযুক্ত ও গুণসম্পন্ন, তাহা রক্ষিত হয় এবং যাহা নিস্তেজ ও নিকৃষ্ট, তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবলেই ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ্ বা জীব আপন হইতে উৎকৃষ্ট জাতির উৎপাদন করিয়া ক্রমে হ্রাস হইয়া, হয়, এককালে

বিলুপ্ত হয়, না হয় হীনভাবে অবস্থান করে। এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বলেই সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট, ঋজু হইতে জটিল ক্রমশই উদ্ভূত হইতেছে।

এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন্ অথবা যোগ্যতরের সংরক্ষণ নিয়মানুসারেই কালে কালে এই পৃথিবীতে মনুষ্য জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। মনুষ্য যে সৃষ্টির নিয়মাতীত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে অথবা একেবারে আকাশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা নহে। যে নিয়মে কালে কালে পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে, যে নিয়মে উদ্ভিদ্ প্রস্তর ও অপরাপর জীব জন্তুর সৃষ্টি হইয়াছে, সেই একই নিয়মবলে মনুষ্যেরও সৃষ্টি হইয়াছে। কি জড় প্রকৃতিতে, কি জীব প্রকৃতিতে, যত প্রক্রিয়া হইতেছে, তৎসমস্তই চিরস্থায়ী নিয়মের অধীন। তাহারা যে সময়ে সময়ে কোন স্বতন্ত্র শক্তির পরিচালন প্রভাবে ঐরূপ হইতেছে তাহা নহে। তৃণ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমুদয় জাতি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইতে যথাক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে। জাতি সকল যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে তাহাদের আকার প্রকার অবস্থা কার্য্য প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে বিসদৃশ ও বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু যখন দেখা যায় যে কি জড় রাজ্যে, কি উদ্ভিদ্ রাজ্যে, কি জীব রাজ্যে, সৃষ্টির সর্ব্বত্রই ধারাবাহিক শৃঙ্খলা বিদ্যমান রহিয়াছে—যখন কি দৈহিক বিষয়ে, কি ইন্দ্রিয় ব্যাপারে, কি প্রজনন ক্রিয়ায়, কি মানসিক গুণে, অনেক বিষয়ে জীব রাজ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের ঐক্য আছে, তখন একই জীব হইতে যে অন্য জীবের সৃষ্টি বা রূপান্তর সংঘটিত হইয়াছে, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ। অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে জাতি সকল এ প্রকার পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া থাকে। যখন অবস্থাভেদ নিবন্ধন গৃহপালিত জন্তুর এত পরিবর্ত্তন হইতেছে, যখন অবস্থাভেদ নিবন্ধন একটী ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড মহীরুহ উৎপন্ন হইতেছে, যখন অবস্থাভেদে নিবন্ধন শোণিত শুক্রের পরিণামে আশ্চর্য্য মানব দেহ উদ্ভূত হইতেছে, তখন ভূমণ্ডলে নূতন জাতি পরম্পরার উৎপত্তিও যে অবস্থাভেদ নিবন্ধন সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। জাতি সকল যদি পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে কোন্ গুলি জাতি, কোন্ গুলি বা এক জাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, তাহা লইয়া এত বিসম্বাদ ঘটিত না। বর্ত্তমান জাতি-

পরম্পরার নিম্ন হইতে নিম্নতর ও উচ্চ হইতে উচ্চতর শৃঙ্খলা যেরূপ সুসম্বদ্ধ রহিয়াছে, তাহাতে ক্রমিক প্রাদুর্ভাবই দেখা যায়। নতুবা সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথম যুগে সরীসৃপের উৎপাদন করিলেন, তৎপরে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া মৎস্য জাতির সৃষ্টি করিলেন, অনন্তর আর এক যুগে তির্য্যক্ জাতির সৃষ্টি করিলেন, ইহা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ।

ক্রম-প্রাদুর্ভাবের নিয়মানুসারে মানব যে নিম্ন জীব হইতে ক্রমশঃ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তৎপক্ষে সংশয় নাই। কেবল যে পৃথিবীর স্তর সকল পরীক্ষা করিয়া সর্ব্বশেষে মানবের বিকাশ ইহা অনুমিত হইয়াছে, তাহা নহে। পরন্তু নিকৃষ্ট জীবগণের সহিত সৌসাদৃশ্য থাকায়ও একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মানব দেহের আন্তরিক গঠন ও ধাতু সকল পর্য্যালোচনা করিলে নিকৃষ্ট জীবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য বোধ হয়। মাংসপেশী, শিরা, শোণিত প্রভৃতি নর-দেহে যেরূপ, অন্যান্য প্রাণীর দেহেও সেই প্রকার। অধিক কি, মস্তিষ্কেরও অবস্থা সর্ব্বত্র সমান দেখা যায়। নিকৃষ্টজীব সকল মানবের ন্যায় সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় এবং উভয়েরই ক্ষত সংরোধ একই ঔষধে নিবারিত হয়। মনুষ্য স্তন্যপায়ী জাতির অন্তর্ভুক্ত। অপরাপর স্তন্যপায়ী জন্তুর সন্তানোৎপাদনাদি মনুষ্যের বংশবিস্তার কার্য্য অপেক্ষা পৃথক্ নহে। খাদ্যের গ্রহণ ও পরিপাক এবং তন্নিবন্ধন শোণিতাদির উৎপত্তি মনুষ্যেও যেরূপ, অন্যান্য জন্তুতেও তদ্রূপ। গর্ভাশয়ে শোণিত ও শুক্র প্রথমে যে অবস্থায় থাকে, তাহা মনুষ্যের ও নিকৃষ্ট জীবের একই রূপ। মানুষের প্রাথমিক ভ্রূণ ও নিকৃষ্ট জন্তুগণের প্রাথমিক ভ্রূণ একই প্রকার। কেবল দেহের আভ্যন্তরিক গঠন ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কেন, অন্যান্য বিষয়েও আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে। মানবের ন্যায় নিকৃষ্ট প্রাণীরও পাঁচটী ইন্দ্রিয় আছে। সুখদুঃখ বোধ, ভয়, সন্দেহ, অপত্য স্নেহ প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল সর্ব্বসাধারণ। এই সকল ও অপরাপর নানা কারণে স্থির হইয়াছে, ক্রমপ্রাদুর্ভাবেই মানবজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবীতে উদ্ভিদে ও জীবে সর্ব্বশুদ্ধ অন্যূন এক কোটী শ্রেণীর জাতি আছে। সৃষ্টিকর্ত্তা এক কোটীবার ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি করিয়াছেন, না, জাতিপরম্পরা নিকৃষ্টতর জাতি হইতে পর্য্যায় ক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে?

মানব সৃষ্টি প্রকৃতির শেষ ও সর্ব্বোচ্চ সৃষ্টি। শুদ্ধ যে ভূপৃষ্ঠের স্তর

সকল পরীক্ষা দ্বারায় একথা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা নহে। অনুমান বলেও আমরা একথা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। বৃক্ষ, লতা, ওষধি, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জল, স্থল, পর্ব্বত, হ্রদ, আকাশ প্রভৃতি সমুদয় স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টির পর তবে এই পৃথিবীতে মনুষ্যের আবির্ভাব হয়। মনুষ্যের জীবন ধারণ জন্য পৃথিবীস্থ সমস্ত দ্রব্যেরই প্রয়োজন। এই সমস্ত অগ্রে সৃষ্ট না হইলে মনুষ্য একদিনের জন্যও পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিতে পারিত না। পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থের সহিতই মানবের সাম্যতা আছে। মানবের দেহরক্ষার জন্য উদ্ভিদ্ চাই, আকরস্থিত ধাতুপদার্থ চাই, সুদূর সমুদ্র গর্ভস্থিত মণি মুক্তাদির আবশ্যক—জলজ জন্তু ও স্থলজ জন্তু—সকলই মনুষ্যের প্রয়োজন। সমুদয় সৃষ্টি মন্থন করিয়াই বিধাতা মানবসৃষ্টি করিয়াছেন। মানব সমুদয় প্রকৃতিরই সার প্রতিকৃতি। সুদূর আকাশ স্থিত সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীও মানব সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। সকলেরই সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ আছে। মানব দেহের জন্য উদ্ভিদ্ রাজ্যে যাহা আছে, ধাতু রাজ্যে যাহা আছে, জীব রাজ্যে যাহা আছে, এমন কি জলরাজ্যে যাহা আছে, সমুদয়ই চাই। পার্থিব এমন কিছু নাই, যাহা মনুষ্যের প্রয়োজনে লাগে না। আবার মানব মনও সমুদয় জীব রাজ্যের মনের সমষ্টি। সর্পের যে ক্রূরতা, শৃগালের যে ধূর্ত্ততা, কুকুরের যে প্রভুভক্তি, উষ্ট্রের যে কষ্টসহিষ্ণুতা, বানরের যে চাতুরি, সকলি মানববুদ্ধির আয়ত্ত। মানবকণ্ঠ সমুদয় জীবেরই ধ্বনির অনুকরণ করিতে পারে—মানবের গতি শক্তিও সর্ব্বজীবের গতিশক্তির সমষ্টি। মানবই সৃষ্টির শেষ বিকাশ। মানবদেহে আসিয়াই বৃক্ষ লতা ধাতু প্রভৃতি জড়রাজ্য ও পশ্বাদি চেতনরাজ্য লয় পাইয়া মানবেরই সম্বর্দ্ধনা করে। সুতরাং মনুষ্য যে শেষসৃষ্টি একথা বুঝাইবার বিশেষ আবশ্যক করে না। সমুদয় সৃষ্টির প্রভু করিয়াই বিধাতা মনুষ্যকে এখানে পাঠাইয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রেও বলে, যে অশীলক্ষ যোনি গত হইলে পর মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। হিন্দু শাস্ত্রের মৎস্যযুগ, বরাহযুগ প্রভৃতি কল্পনাও এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনেক পোষকতা করে। হিন্দুর মতে সৃষ্টি যে কত কালের তাহার সংখ্যা করা যায় না। প্রথমে জলের সৃষ্টি হয়। সমুদয় জগৎ জলময় থাকে। পরে কল্পান্তকাল ধরিয়া সেই জল হইতে স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি

সমুদয় পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীর এক এক স্তর পরীক্ষা করিলে জানা যায়, যে এই সৃষ্টি এক দিনে বা দুই দিনে সম্পাদিত হয় নাই। বহু যুগান্তর ধরিয়া এই সৃষ্টি ক্রমশই বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে।

আদিম জন্তুবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া বিবেচনা করিলে আমরাই ভূমণ্ডলের শেষ ও সর্ব্ব প্রধান অধিবাসী বলিয়া বোধ হয়। এ পর্য্যন্ত মনুষ্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীব ভূমণ্ডলে আগমন করে নাই, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। আদিম অবস্থাতে ম্যামথ অর্থাৎ কেশরযুক্ত হস্তী, বৃহৎ বৃহৎ সর্প, ও অন্যান্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জীব সকল এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল। ঐ সকল জন্তু এক্ষণে পৃথিবী হইতে এক কালে অন্তর্হিত হইয়াছে। মনুষ্যের আদিম অবস্থায় পৃথিবীতে এই সকল পশুরই রাজত্ব ছিল। মনুষ্য ইহাদের ভয়ে সদা সশঙ্কিত হইয়া গিরিগুহামধ্যে বাস করিত। মনুষ্যকে একেবারে নিঃসহায় করিয়া প্রকৃতি পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। মনুষ্য কেবল নিজ বুদ্ধিবলেই ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর রাজত্ব লাভ করিয়াছে। বোধ হয় মনুষ্য সৃষ্ট হইয়া প্রথমে আহার অন্বেষণ করিতে সমুদয় সময় ব্যয় করিত। ক্ষুধাতুর হইলে যে পর্য্যন্ত ক্ষুধা শান্তি না হয়, ততক্ষণ কোন কার্য্য ভাল লাগে না। সুতরাং তৎকালে মনুষ্যের আহারের সংস্থান করাই প্রধান কার্য্য ছিল। মনুষ্য যতই কেন অনভিজ্ঞ হউক না, স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্কুর সর্ব্বকালেই ছিল। প্রকৃতি তাহার অন্তঃকরণে যে প্রখর বুদ্ধিবৃত্তির বীজ বপন করিয়া দিয়াছেন, সেই বুদ্ধি বলেই সে সমুদয় অজ্ঞাত বিষয় উদ্ভাবন করিতে চিরদিনই সক্ষম। প্রথমতঃ মনুষ্য লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ দ্বারা পশু হনন করিত। কিন্তু যখন দেখিল, তদ্দ্বারা প্রকৃষ্ট রূপে পশ্বাদি হনন করা যায় না, তখন স্বকীয় বুদ্ধি প্রভাবে ধনুঃশরের সৃষ্টি করিল। মনুষ্যের আদিম অবস্থার যদিও কোন লিখিত বৃত্তান্ত নাই, তথাপি পুরাকালিক মনুষ্যের যে সকল চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা তাহাদের আহার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। বর্ত্তমানকালে অনেক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সেই তমসাবৃত কালের অনেক বিষয় আলোকে আনিয়াছেন। অতি পূর্ব্বকালে মানবজাতি বাটী নির্ম্মাণ কৌশল অবগত ছিল না। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না থাকায়, তাহারা গিরিগুহায় বাস করিত। ক্রমে পর্ব্বতাবৃত স্থান সকল তাহারা অধিকার করিয়া-

ছিল ও সুবিধামত বিল ও হ্রদে দ্বীপ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিত। ইউরোপ খণ্ডে গিরি-গুহা প্রভৃতি পূর্ব্বকালিক মনুষ্যের বাসস্থানে ও সমাধি-মন্দিরে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র ও তৈজসাদি পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা পণ্ডিতেরা আদিম মনুষ্যের পুরাবৃত্ত দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। প্রথম প্রস্তর-কাল ও দ্বিতীয় ধাতুকাল। প্রথম কালের যে সকল অস্ত্র ও তৈজসাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সে সমুদয় প্রস্তরনির্ম্মিত। কোন কোন অস্ত্র পশ্বাদির অস্থি বা শৃঙ্গে নির্ম্মিত। পর পরকালে মনুষ্যের বাস স্থানে শিকারোপযোগী অনেক অস্ত্র ও পিত্তলনির্ম্মিত তৈজসাদি দেখা যায় বটে, কিন্তু লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র সর্ব্ব শেষে দেখিতে পাওয়া যায়। লৌহ আবিষ্কারের পর হইতেই মনুষ্য কৃষি-কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে শিখিয়াছে। এইরূপে ক্রমে অভাব জ্ঞান ও তৎপূরণার্থ বুদ্ধি বৃত্তি পরিচালনই সভ্যতা বৃদ্ধির নিদান।

মনুষ্য জাতির অবয়ব, বর্ণ, ও ভাষাভেদ দেখিয়া বলিতে পারা যায়, তিনটী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ক্রমবিকাশের ফলে আদিম মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই তিন শ্রেণীকে ককেশীয়, মঙ্গোলীয় ও নিগ্রো নামে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অভিহিত করিয়াছেন।

এই আদিম মনুষ্য মধ্যে ভাষার সৃষ্টি যে কিরূপে হইল, তাহা নির্ণয় করা অথবা তাহারা কিরূপ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, তাহা জানিতে পারা অতি সুকঠিন। আদিম মনুষ্য সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করুক বা নাই করুক, স্ত্রী পুরুষে এক সঙ্গে থাকিতে হইলেও ভাষার প্রয়োজন। এ কারণ অনেকে অনুমান করেন, প্রথমতঃ ভাষা ইঙ্গিতাত্মক ছিল। কাল সহকারে মনো-বৃত্তির পরিচালনে উহা বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। এই ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল, তদ্বিষয়ে তিনটী মত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ভাষা অপৌরুষেয় অর্থাৎ ভাষা সৃষ্টিতে মনুষ্যের কোন হস্ত নাই, উহা ঈশ্বর-প্রদত্ত। তাঁহারা বলেন, যখন ভাষাব্যতীত মনের কোন চিন্তা অগ্রসর হয় না, তখন মনুষ্য সৃষ্টির পূর্ব্বে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। অপর কেহ কেহ বলেন, যে দশ জনে একত্র হইয়া যাহাকে যে নাম দিয়াছে, সেই নাম বরাবর চলিয়া আসিতেছে এবং এইরূপে ভাষা প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু এই মত অবৈজ্ঞানিক। কেননা, প্রথমে যাহারা একত্র হইয়া দ্রব্যাদির নামকরণ করিয়াছিল,

তাহারা তো কথা কহিয়া তবে ঐরূপ নামকরণ করিবে। সুতরাং ইহাদের মতে ভাষা না থাকিলে ভাষার সৃষ্টি হইতে পারে না। এ কারণ ঐ সকল মতের প্রতি আস্থা না করিয়া এক্ষণে ভাষা উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত মত, তাহা বলা যাইতেছে। ভাষা অনুকৃতি মূলক। প্রাকৃতিক অনেক বস্তুর দ্বারা এক একটা শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সেই সকল শব্দের অনুকরণে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। নদী, কল কল রবে প্রবাহিত হইতেছে, মেঘ, গর গর শব্দে গর্জ্জন করিতেছে. কাক, কা কা রব করিতেছে, বিড়াল, মিউ মিউ করিতেছে—ইত্যাদি নানা প্রকার শব্দের অনুকরণ করিয়া মনুষ্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছে। ভাষা সকল আলোচনা দ্বারা জানিতে পারা যায়, যে পৃথিবীতে যত প্রকার ভাষা আছে, তাহা তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। এক জাতীয় ভাষার ধাতুর সঙ্গে যোগমাত্র দ্বারা বাক্যের গঠন হয়। কোন ধাতুর কোন প্রকার রূপান্তর হয় না। এই সকল ভাষার বিভক্তি নাই। ইহাদিগকে "সংযোগ অসাপেক্ষ" ভাষা বলে। চীন, শ্যাম, আনাম বা ব্রহ্ম দেশীয় ভাষা এইরূপ। ইহা মঙ্গোলীয়দিগের ভাষা। তুরানীয় শ্রেণী নামে অভিহিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষাতেও বিভক্তি নাই, কিন্তু উহা উপসর্গ ও প্রত্যয়াদি ধাতু দ্বারা রূপান্তরিত হয়। এই ভাষার ধাতুতে ধাতুতে বা ধাতু ও সর্ব্বনামে এক প্রকার যোগ হয়। এই সকল ভাষাকে "সংযোগ সাপেক্ষ" ভাষা বলে। তামিল ভাষা. তাতার ভাষা এবং আমেরিকার আদিম জাতীয় ভাষা এইরূপ। ইহার নাম নিগ্রিটো বা দ্রাবিড় শ্রেণীয়। তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাতেই প্রকৃষ্ট রূপে বিভক্তি আছে, সংযোগ কালে ধাতুর ও সর্ব্বনামের রূপান্তর ঘটে। ইহাদিগকে বিভক্তিসম্পন্ন ভাষা বলে। পৃথিবীর যত শ্রেষ্ঠ ভাষা, সকলই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার নাম ককেসিও বা আর্য্যভাষা। ভূমণ্ডলের তাবৎ মনুষ্য কায়িক ও বাচিক ভেদে পূর্ব্বোক্ত তিন স্বাভাবিক জাতিতে বিভক্ত। আরবী, য়িহুদী, গ্রীক্, লাটিন, ইংরাজি, ফরাশি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা সকল এই তৃতীয় শ্রেণীভূক্ত। ধাতু, বিভক্তি চিহ্ন ও সর্ব্বনাম লইয়া এই সকল ভাষা গঠিত হইয়াছে এবং এই সকল ভাষা দেশ ভেদে ও জাতি ভেদে বাহ্যতঃ পার্থক্য প্রতীত হইলেও অথবা ইহারা সহস্র সহস্র প্রকারে বিভক্ত হইলেও ইহাদের মূল যে এক, তাহা এক্ষণে

ভাষা বিজ্ঞান দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই তৃতীয় শ্রেণীর ভাষা গুলির মধ্যে অনেক গুলি প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাতেই ভাষার মূলগত ধাতু, বিভক্তি চিহ্ন ও সর্ব্বনাম এক। সুতরাং এই সকল ভাষা যে একটী প্রাচীন মূল ভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

ভারতবর্ষের সংস্কৃত এবং পালি প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা, বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি সংস্কৃত মূলক আধুনিক ভাষা, আধুনিক ও প্রাচীন পারসীক-দিগের ভাষা, গ্রীক্ ও লাটিন ভাষা, এবং এই দুই ভাষা হইতে ফরাশীয়, ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি যে সকল ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে; জার্ম্মানি, ওলন্দাজী, ইংরাজি, দিনেমারি, সুইডেনি, নরওয়ে এবং রুস্ প্রভৃতি ভাষা সকলই সেই এক প্রাচীন আর্য্য ভাষা হইতে উৎপন্ন। যে জাতি ঐ প্রাচীন ভাষা ব্যবহার করিতেন, ভাষাবিজ্ঞান দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে তাঁহারাই আর্য্য জাতি। এবং আর্য্যজাতীয় ভাষা সমুৎপন্ন অপরাপর ভাষা গুলি আর্য্য-ভাষা বলিয়া কথিত হয়। যে সকল জাতির ভাষা আর্য্যভাষা তাহারা আর্য্য বংশীয় বলিয়া অনুমিত ও বর্ণিত হইয়া থাকে। যাহারা আর্য্যবংশ সম্ভূত নহে, তাহারা অনার্য্য জাতি।

এক্ষণে কথা এই যে প্রাচীন আর্য্য জাতি যাঁহারা পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ জাতির এবং আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ, তাঁহারা কোথায় বাস করিতেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা আর্য্য ভাষা সকলের বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মত এই, যে আর্য্যেরা ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী নহেন। অন্যত্র হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাঁহারা যখন আসেন, তখন ভারতবর্ষে অনার্য্য জাতির বাস ছিল। আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকে জয় করিয়া বশীভূত অথবা বন্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, যে হিন্দুকুশ পর্ব্বত-মালার উত্তরে আসিয়ার মধ্য-ভাগে প্রাচীন আর্য্যভূমি ছিল, সেই স্থান হইতে তাঁহারা দলে দলে বাহির হইয়া দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। কোন দল প্রাচীন গ্রীস্ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া কাল ক্রমে শিল্প ও সাহিত্যাদি সম্বন্ধে অতুল-নীয় হইয়া জগৎবিখ্যাত হইয়াছিলেন। আর এক দল রোম রাজ্য সংস্থাপন করতঃ এককালে পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। অপর এক দল ইংলণ্ড ও

জর্ম্মনিতে প্রবেশ করিয়া সভ্য জগতের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন এবং এক দল ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া জ্ঞানের অনন্ত মহিমা সংস্থাপন করিয়াছেন।

যে সকল আর্য্য ভারতবর্ষাভিমুখে প্রয়াণ করেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহারা সপ্তসিন্ধু শোভিত পঞ্জাব প্রদেশে আসিয়া বসবাস করেন। অতঃপর তাঁহারা ব্রহ্মাবর্ত্তে, তার পর ব্রহ্মর্ষি দেশে, তৎপরে মধ্যদেশে এবং সর্ব্বশেষে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী হইয়াছিলেন।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের সামাজিক অবস্থান, গার্হস্থ্য-প্রণালী, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি এক্ষণকার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। আর্য্যগণ যখন পঞ্জাব প্রদেশের স্বরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদী তীরে প্রথমে আবাস ভূমি মনোনীত করিয়া বসবাস করিতে থাকেন, তখন ঐ দেশের আদিম নিবাসী অনার্য্যগণের সহিত তাঁহাদের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অনার্য্যগণ সেই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত গুহায় বা অরণ্যে গমন করিয়া বসবাস করিতে থাকে এবং আর্য্যগণের উপর দৌরাত্ম্য করিয়া তাঁহাদের দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া জীবন যাপন করিতে থাকে। ঋগ্বেদের নানা স্থানে এই কৃষ্ণবর্ণ দস্যুগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, তাহাদিগকে একেবারে ধ্বংস করিবার মানসে প্রাচীন আর্য্যগণ দেবতার নিকট বারম্বার প্রার্থনা করিয়াছেন। অনার্য্যগণকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া যে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে আর্য্যাবর্ত্তে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ঋগ্বেদে আছে। ঋগ্বেদের রচনাকালে অর্থাৎ তাঁহাদের ভারতে বসবাস কালে যে তাঁহারা সিন্ধু নদী শোভিত ভূভাগে বাস করিয়াছিলেন, তাহারও বিস্তর প্রমাণ ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্ধু নদী এবং ইহার পঞ্চশাখা ও সরস্বতী এই সকল নদীর কথাই বেদে বারম্বার উক্ত হইয়াছে—দুই এক স্থানে মাত্র গঙ্গা ও যমুনার উল্লেখ আছে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন পার্শ্ববর্ত্তী অনার্য্য জাতিগণের ন্যায় তাঁহারা অসভ্য ছিলেন না। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যে অনার্য্যগণের ভাষা আর্য্যগণের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অনার্য্যগণের ভাষাকে পশুরব বলিয়াও বেদে বর্ণিত আছে। শুদ্ধ ভাষা বিষয়ে যে তাঁহারা অনার্য্যগণের সহিত

পৃথক্ ছিলেন তাহা নহে। তাঁহাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতি সমাজ সংস্থান গার্হস্থ্যাদি অনার্য্যগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। আর্য্যগণ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; বস্ত্রবয়ন প্রথা অবগত থাকাতে উত্তমোত্তম পট্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া জনসমাজে বিচরণ করিতেন; গৃহ নির্ম্মাণ কৌশল অবগত থাকাতে প্রশস্ত প্রশস্ত পর্ণ গৃহ এমন কি অট্টালিকা সকলও নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বসতি করিতেন; লৌহাদি ধাতু সকলের ব্যবহার জ্ঞাত থাকায় তাঁহারা প্রয়োজনোপযোগী সমুদয় অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিতেন। স্বর্গে ও নরকে এবং আলোকে ও অন্ধকারে যেরূপ প্রভেদ, আর্য্য ও অনার্য্যে সেইরূপ প্রভেদ ছিল। শুদ্ধ যে প্রাচীন আর্য্যগণ তদানীন্তন অনার্য্যজাতি-গণের অপেক্ষা সভ্য ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহাদের সেই সভ্যতালোক পারম্পর্য্যক্রমাগত হইয়া অদ্যাপিও আমাদিগকে আলোকিত করিতেছে। আমাদের মধ্যে ইদানীন্তন যেরূপ বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, যেরূপ অতিথিসেবা, গোসেবা, দায় ভাগ, অঙ্ক, জ্যোতিষ, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ঈশ্বরোপাসনা, সম্বন্ধনির্ণয়, দশবিধ সংস্কার, রাজনীতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত আছে, তৎসমস্তই সেই প্রাচীন আর্য্যগণের অনুকরণে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিবাহ স্থলে দম্পতি যুগল মধ্যে পরস্পর প্রতিজ্ঞা বদ্ধ রাখিবার জন্য সেই গণনাতীত কালের যে সকল বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, আমাদের বিবাহ পদ্ধতিতে সেই সকল মন্ত্র ও অনুষ্ঠান আজও প্রচলিত রহিয়াছে। তাঁহারা যেরূপে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন, আজও আমরা তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকি। স্নান, দন্ত ধাবন, অন্ন গ্রহণ, শয়ন, উপনয়ন, গর্ভাধান, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি সমুদয় সৎকর্ম্মে আমরা আজও মন্ত্রগত এবং অনুষ্ঠানগত তাঁহাদেরই অনুকরণ করিয়া থাকি। ঋগ্বেদ পাঠে জানা যায়, প্রাচীন আর্য্য সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা প্রবল ছিল, কিন্তু বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না। দেশ বিদেশে সমুদ্র পারে বাণিজ্য প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু খাদ্যাখাদ্যের এত বিচার ছিল না। বর্ত্তমান দেব দেবী পূজাও প্রচলিত ছিল না; তখন সকলেই সরলচেতা ছিল—যুদ্ধাদিতে সকলেরই সহানুভূতি হইত—তখন কেবল ক্ষত্রিয়গণের স্কন্ধে যুদ্ধ ভার অর্পিত হয় নাই। তৎকালে যাঁহাদিগকে ঋষি বলা যাইত, তাঁহারাও যুদ্ধাদি কার্য্যে ব্যাপৃত

থাকিতেন। আজ কাল আমরা ঋষি শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি, প্রাচীন বৈদিক কালে ঋষি শব্দ সে অর্থে ব্যবহৃত হইত না। আমরা ঋষি শব্দে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ ধ্যানধারণাপরায়ন যোগরত অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী অলৌকিক পুরুষ মনে করি। কিন্তু বেদে যাঁহাদিগকে ঋষি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা সাংসারিক লোক ছিলেন। তাঁহারা পশ্বাদি পালন, ক্ষেত্রকর্ষণ এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অনার্য্যগণের সহিত যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন এবং ঈশ্বরের নিকট ধন ধান্য পশু ও জয় লাভ প্রভৃতির জন্য প্রার্থনা করিতেন। তৎকালে এক এক পরিবারের কর্ত্তৃপক্ষই ঋষি নামে অভিহিত হইতেন।

আজ কাল ভারতবাসী আর্য্যগণ নানা বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন সিন্ধুতীরে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে বর্ণ ভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না। ঋক্ বেদের ন্যায় প্রাচীনতম গ্রন্থ আর পৃথিবীতে নাই। উহাই আর্য্যগণের আদি পুস্তক। উহাতে দশ সহস্র ঋক্ আছে। সেই সকল ঋক্ পাঠ করিলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যুদ্ধ, বিবাহ, যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত সমুদয় ব্যাপারই ঐ সকল ঋকে লিখিত আছে। কিন্তু উহার কুত্রাপিও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদি ভেদে বর্ণভেদ প্রথার উল্লেখ নাই। যদি তৎকালে বর্ণ ভেদ প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে আর্য্য সমাজের এমন একটী গুরুতর প্রথা কি সমুদয় বেদে উল্লিখিত হইত না? ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী অপরাপর যে কোন গ্রন্থই পাঠ কর, গ্রন্থ বৃহৎই হউক, আর ক্ষুদ্রই হউক, কিছু না কিছু পরিমাণে তাহাতে বর্ণ ভেদের উল্লেখ থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু ঋগ্বেদের ন্যায় অতি সুবৃহৎ বিশেষতঃ আদিম পুস্তকে যে বর্ণভেদ প্রথার উল্লেখ নাই—তৎকালে যে বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বৃত্তিগত জাতিভেদ বর্ণ-ভেদের নিদান। ঋগ্বেদে বর্ণ শব্দের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সে বর্ণ শব্দে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চাতুর্ব্বর্ণ্য বুঝায় না—সেখানে বর্ণ শব্দে রঙ্‌ বুঝায়—তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্য ও গৌরবর্ণ আর্য্যকে বুঝায়। আর্য্যদিগের উজ্জ্বলবর্ণ রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা

করিতে দেখা যায়। ঋগ্বেদে ক্ষত্রিয় শব্দের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহাতে দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয় বুঝায় না—ক্ষত্রিয় শব্দে বলবান বুঝায় ও উহা দেবতার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদে বিপ্র শব্দের যাহা উল্লেখ আছে, তাহা ব্রাহ্মণ বর্ণকে বুঝায় না—তাহা জ্ঞানীকে বুঝায় এবং উহা দেবতার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এমন কি ঋগ্বেদে যে ব্রাহ্মণ শব্দের উল্লেখ আছে, উহা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে বুঝায় না। পরন্তু যাঁহারা মন্ত্র রচনা করিতেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিত। ঋগ্বেদের সময়ে পৌরোহিত্য ক্রিয়ার জন্য একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রয়োজন ছিল না। অথবা দেব দেবীর উপাসনা জন্য মন্দির বা স্বতন্ত্র গৃহের ব্যবস্থা ছিল না। গৃহপতিগণ স্ত্রী পুরুষ সকলেই স্ব স্ব গৃহে উপাসনা করিতেন। তখন সকলেই বেদ উচ্চারণ করিতে পারিত। স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত বেদ মন্ত্র দ্বারা স্ব স্ব ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহ করিত। ঋগ্বেদের সময় আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যগণের অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ হইত। কিন্তু তৎকালে যদি পরবর্ত্তী কালের ন্যায় চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়গণ ঐ যুদ্ধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এরূপ লেখা থাকিত। কিন্তু ঋগ্বেদের কুত্রাপিও এরূপ বিবরণ নাই। তখন সমুদয় সমাজই একতাবদ্ধ ছিল। বৃত্তিভেদে বর্ণভেদ ছিল না। ঋক্‌বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, শান্তিকালে যে সকল আর্য্য কৃষি ও গোপালন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহারাই আবার অনার্য্যগণের উপদ্রব হইতে গ্রাম বা নগর রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন।

সমগ্র ঋক্‌বেদের মধ্যে আমরা দশম মণ্ডলের একটী ঋকে কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চাতুর্ব্বর্ণ্যের উৎপত্তির বিবরণ দেখিতে পাই। কিন্তু ইদানীন্তন কালের বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যে ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলটী আধুনিক। দয়ানন্দ স্বরস্বতী কহেন,—সেই ঋক্ একটী রূপক মাত্র। ঋক্‌বেদের সময় অর্থাৎ আর্য্যজাতির অতি প্রাচীনকালের ইতিবৃত্তে যে চাতুর্ব্বর্ণের ব্যবস্থা ছিল না, তাহা মহাভারতাদি গ্রন্থ সকল পর্য্যালোচনা করিলেও জানা যায়। মহাভারতের এক স্থানে আছে,—যে আদিমকালে সমস্ত জগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল। কাল ক্রমে তাহাদের মধ্যে আচার ও বৃত্তির প্রভেদ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সমুদয় লোক এক বর্ণ ও

ব্রাহ্মণ ছিল, মনুর অগ্রজন্মা বাক্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মনু অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণগণকে অগ্রজন্মা শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে আছে, যে সত্যযুগে কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ ছিল; ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়গণ জন্ম গ্রহণ করেন এবং তদনন্তর চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। চাতুর্ব্বর্ণ্য যে এক দিনে সৃষ্টি হয় নাই, কালে কালে গুণ ও কর্ম্মানুসারে যে ইহা প্রচলিত হইয়াছে, শাস্ত্র সকল পর্য্যালোচনা করিলে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। ঋক্‌বেদের সময়ে বর্ণভেদ ছিল না—ঋক্‌বেদের পরবর্ত্তী গ্রন্থ সকল আলোচনা করিলে যদিও বর্ণভেদের আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তথাপি তাহাতে বর্ত্তমান কালের ন্যায় বর্ণভেদের কঠোরতা দেখা যায় না। এক্ষণে যেমন যে শূদ্র আছে, সে আজন্ম শূদ্র থাকিবে, যিনি ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি গুণহীন হইলেও আজন্ম ব্রাহ্মণ থাকিবেন—এক্ষণকারকালে যেমন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিবেন, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করিবেন, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরের অন্ন ভোজন করিবেন না প্রভৃতি প্রতি কর্ম্মে লোকে বর্ণ বিচার করে, প্রাচীনকালে সেরূপ ছিল না। এক্ষণকারকালে বর্ণভেদ বংশগত, বৃত্তিগত বা গুণগত নহে। প্রাচীন শাস্ত্র সকল আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে এক পিতার চারি পুত্রের মধ্যে কেহবা ব্রাহ্মণ, কেহবা ক্ষত্রিয় কেহবা বৈশ্য ও কেহবা শূদ্র ছিলেন। সকলেই জানেন, বিখ্যাত বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে জ্ঞানের বাহুল্য দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে, (ক) ক্ষত্রিয় যে অপ্রতিরথ, তাঁহার পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি, এই মেধাতিথি হইতে কাণ্বায়ণ ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হইয়াছেন। মহাভারতীয় হরিবংশে আছে, (খ) ক্ষত্রিয় দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু রাজা ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মৈত্রায়ণ এবং সোম। তদ্বংশে মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হয়েন। বিশেষতঃ এক এক বংশে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

---

(ক) অপ্রতিরথাৎ কণ্বস্তস্যাপি মেধাতিথি র্যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজা বভূবুঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ ১৯ অধ্যায়।

(খ) দিবোদাসস্য দায়াদো ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ুনৃপঃ।

মৈত্রায়ণ স্ততঃ সোমো মৈত্রেয়াস্তঃ ততঃ স্মৃতাঃ॥

মহাভারতীয় হরিবংশ। ৩২ অধ্যায়,

বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণ প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণে আছে, (গ) মনু বৈবস্বতের পুত্র করুষ হইতে মহাবল ক্ষত্রিয় সকল উৎপন্ন হইলেন। মনু বৈবস্বতের পুত্র নেদিষ্ঠ। কিন্তু নেদিষ্ঠের পুত্র নাভাগ বৈশ্য হইলেন। মনু বৈবস্বতের পুত্র পৃষধ্র গুরুর এক গাভিকে হনন করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

মহাভারতীয় হরিবংশে আছে, (ঘ) নাভাগারিষ্ঠের যে দুই পুত্র বৈশ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা আবার ব্রাহ্মণ হইলেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে, (ঙ) সুনহোত্রের তিন পুত্র—কাশ, লেশ এবং গৃৎসমদ; গৃৎসমদের পুত্র শৌনক, এই শৌনকের বংশে চারি বর্ণ উৎপন্ন হয়। বায়ু পুরাণেও আছে, (চ) গৃৎসমদের পুত্র শুনক, তাঁহার পুত্র শৌনক; তাঁহার বংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই উৎপন্ন হয়। যাঁহারা বিশিষ্ট কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহারাই দ্বিজ হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে, (ছ) ধৃষ্টকেতুর পুত্র বৈণুহোত্র, তাঁহার পুত্র ভার্গ, ভার্গের পুত্র ভার্গভূমি। এই ভার্গভূমি হইতে

(গ) করুষাৎ কারুষামহাবলাঃ ক্ষত্রিয়া বভূবুঃ।
নাভাগোনেদিষ্ঠ পুত্রস্তু বৈশ্যতামগমৎ।
পৃষধ্রস্তু গুরুগোবধাৎ শূদ্রত্বমগমৎ॥
বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ। ১ অধ্যায়।

(ঘ) নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ॥
মহাভারতীয় হরিবংশ। ১১ অধ্যায়।

(ঙ) কাশ লেশ গৃৎসমদাস্ত্রয়োঽস্যা ভবন্।
গৃৎসমদস্য শৌনক শ্চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তয়িতা॥
বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ। ৮ অধ্যায়।

(চ) পুত্রো গৃৎসমদস্য শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ॥
এতস্যবংশে সমুদ্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥
বায়ুপুরাণ।

(ছ) ধৃষ্টকেতুস্ততশ্চ বৈণুহোত্র স্ততশ্চভার্গঃ।
ভার্গস্য ভার্গভূমি রতশ্চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবৃত্তিঃ॥
বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ। ৮ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণেরই উদ্ভব হয়। মহাভারতীয় হরিবংশে আছে ;—(ক) বৎস হইতে বৎস ভূমি এবং ভার্গব হইতে ভার্গভূমি জন্মে। ভার্গবংশোদ্ভব অঙ্গিরসের পুত্র সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি ভাগে বিভক্ত হয়েন। শাস্ত্রে যেমন ব্রহ্মা হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বিভিন্ন বর্ণের চারিটী পুত্র জন্মিবার কথা লেখা আছে, তদ্রূপ অপরাপর ব্রাহ্মণ বংশ হইতেও যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভিন্ন গুণকর্ম্মানুসারে উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বায়ু পুরাণে আছে,—কৃত যুগে বর্ণভেদ ছিল না ; পরে লোকের কর্ম্মানুসারে ব্রহ্মা বর্ণভেদ ব্যবস্থা করিলেন। মনুষ্যের মধ্যে যাহাদিগকে তিনি প্রভু শক্তি এবং বীরত্ব সম্পন্ন দেখিলেন, তাহাদিগকে তিনি ক্ষত্রিয় করিলেন। যাহাদিগকে সত্যবাদী, ঈশ্বর-পরায়ণ এবং জ্ঞান প্রচারে উৎসুক দেখিলেন, তাহাদিগকে তিনি ব্রাহ্মণ করিলেন। যাহাদিগকে তিনি সাংসারিক, কার্য্যপটু, পরিশ্রমী এবং কৃষিজীবী দেখিলেন, তাহাদিগকে তিনি বৈশ্য করিলেন এবং যাহাদিগকে তিনি নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত, মল পরিষ্কারক প্রভৃতি দেখিলেন, তাহাদিগকে তিনি শূদ্র করিলেন। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে আছে, যে সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্মণই ছিলেন, পরে ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হয়। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে আছে, রক্তবর্ণ গৌরাঙ্গ দ্বিজগণ যাঁহারা ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত, উগ্র ও ক্রোধন স্বভাব এবং যাগ যজ্ঞ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইলেন, পীতবর্ণ দ্বিজ সকল যাঁহারা গো ও কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন এবং ধর্ম্ম ও ক্রিয়া কলাপ বর্জ্জিত হইলেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং কৃষ্ণবর্ণ দ্বিজ সকল যাঁহারা মিথ্যাপ্রিয়, অত্যাচার রত, সংসারাসক্ত ও নীচ কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহক্ষম, তাঁহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

(ক) বৎসস্য বৎসভূমিস্তু ভার্গভূমিস্তু ভার্গবাৎ।
এতেত্বঙ্গিরসঃ.পুত্রাঃ জাতাবংশেঽথ ভার্গবে।
, ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ॥
মহাভারতীয় হরিবংশ। ৩২ অধ্যায়।

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতঃ॥
কামভোগপ্রিয়া স্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ।
ত্যক্তধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃত ক্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টা স্তেদ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

মহাভারতীয় মোক্ষ ধর্ম্ম।

পূর্ব্বে প্রয়োজন ও ক্ষমতানুসারে এক বর্ণের প্রতি অন্য বর্ণের বৃত্তি এবং ব্যবহার করিতে বিশেষ নিষেধও ছিল না। মনুতে আছে;—

অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্ম্মণা।
জীবেৎ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মেণ সহ্যস্য প্রত্যনন্তরঃ॥

স্বকীয় বৃত্তি দ্বারা ব্রাহ্মণ যদি জীবিকা অর্জ্জনে অসমর্থ হয়েন, তবে গ্রাম নগর রক্ষণাদি ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিবেন। যেহেতু এই তাঁহার নিকটবর্ত্তী বৃত্তি।

উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথংস্যাদিতি চেদ্‌ভবেৎ।
কৃষি গো রক্ষমাস্থায় জীবেৎ বৈশ্যস্য জীবিকাং॥

স্বীয় বৃত্তি এবং ক্ষত্রিয় বৃত্তি উভয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন না হইলে কৃষি, গো রক্ষা প্রভৃতি বৈশ্যের কার্য্য করিবেন।

"বৈশ্যোজীবন্ স্বধর্ম্মেণ শূদ্র বৃত্ত্যাপি বর্ত্তয়েৎ॥"

বৈশ্য স্বীয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জনে অশক্ত হইলে শূদ্র বৃত্তি করিবেন। এবং উপায় হীন স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার পালনে অক্ষম শূদ্রেরও দ্বিজ শুশ্রূষাতে জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে, শিল্প কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নিষ্পন্ন করিবেন। মনু বলেন;—

"যথাযথা হি সদ্‌বৃত্তমাতিষ্ঠত্যনুসূয়কঃ।
তথা তথেমঞ্চামুঞ্চ লোকং প্রাপ্নোত্যনিন্দিতঃ॥"

অনুসূয়ক শূদ্রও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের আচার অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে যশ ও পরলোকে স্বর্গ লাভ করেন।

আজকাল যেমন গুণ থাকুক বা নাই থাকুক, কর্ম্মবান্ হউক বা নাই হউক, ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণ হইবেক, অথবা ক্ষত্রিয়াদির বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেই ক্ষত্রিয়াদি হইবেক, পুরাকালে বর্ণভেদের এতদূর কঠোরতা ছিল না। তৎকালে কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি চাতুর্ব্বর্ণের উন্নতি ও অধোগতি ছিল। ব্রাহ্মণ কর্ম্মদোষে শূদ্র হইত এবং শূদ্রও কর্ম্মগুণে ব্রাহ্মণশ্রেণীতে উন্নীত হইত। মনুতে আছে:—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাত মে বন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যত্তথৈবচ॥"

কর্ম্মানুসারে শূদ্র ব্রাহ্মণপদ প্রাপ্ত হয়েন এবং ব্রাহ্মণও কর্ম্মানুসারে শূদ্র হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরও এইরূপ ব্যবস্থা জানিবে।

মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্বে আছে:—

"এভিস্তু কর্ম্মভির্দ্দেবি শুভৈরাচরিতৈ স্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥
এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দ্দেবি ন্যূনজাতি কুলোদ্‌ভবঃ।
শূদ্রোপ্যাগম সম্পন্নো দ্বিজোভবতি সংস্কৃতঃ॥
ব্রাহ্মণোঽপ্যসদ্‌বৃত্তঃ সর্ব্ব সঙ্করভোজনঃ।
ব্রাহ্মণ্যং সমনুৎসৃজ্য শূদ্রোভবতি তাদৃশঃ॥
কর্ম্মভি শুচিভির্দ্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মানুশাসনং॥
স্বভাবং কর্ম্মচ শুভং যত্র শূদ্রেঽপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ সদ্বিজাতে বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥

ন যোনি র্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং নচ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেবতু কারণং॥
সর্ব্বোহয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন চ বিধীয়তে।
বৃত্তেস্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥
ব্রহ্মস্বভাব কল্যাণিঃ সমঃ সর্ব্বত্র মে মতিঃ।
নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি সদ্বিজঃ॥
এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা-শূদ্রো ভবেদ্দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতো ধর্ম্মাৎ যথা-শূদ্রত্ব মাপ্নুতে॥"

শূদ্র এই সকল শুভ কর্ম্ম এবং শুভ আচরণ করিলে ব্রাহ্মণ হয়েন এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয় হয়েন। এই সকল কর্ম্ম করিলে অতি হীন বংশোদ্ভব শূদ্র আগমসম্পন্ন সংস্কারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হয়েন। যে সর্ব্বসঙ্করভোজনকারী ব্রাহ্মণ অসচ্চরিত্র হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্র হয়েন। কর্ম্ম দ্বারা জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধচিত্ত শূদ্রসন্তান শুচি ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজনীয়, এই ব্রহ্মের অনুশাসন। শূদ্রসন্তান যদি শুভকর্ম্ম এবং উত্তম স্বভাববিশিষ্ট হয়েন, তবে তিনি দ্বিজ অপেক্ষা নিশ্চিত শ্রেষ্ঠ, ইহা আমার অভিপ্রায় জানিবে। উত্তম কুলে জন্ম, সংস্কার, বেদপাঠ এবং উত্তমের সন্তান হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না। যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র, সেই ব্রাহ্মণ। চরিত্রের দ্বারাই সকলে ব্রাহ্মণ হয়। শূদ্র সচ্চরিত্র হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মের স্বভাব সর্ব্বত্র সমান, এই আমার অভিপ্রায়। অতএব নির্গুণ, নির্ম্মল ব্রহ্ম যাহার হৃদয়ে আছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যে প্রকারে শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়েন এবং ব্রাহ্মণ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে শূদ্র হয়েন, এই গুহ্য বাক্য তোমাকে বলিলাম।

"ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যোবর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে
জাতি পরিবৃত্তৌ॥১॥
অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে
জাতি পরিবৃত্তৌ॥২॥"
(আপস্তম্ব সূত্র)

ধর্ম্মাচরণ দ্বারা নিকৃষ্ট বর্ণ নিজাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং যে বর্ণে যোগ্য হইবে, সেই বর্ণে গণনীয় হইবে। তদ্রূপ অধর্ম্মাচরণ দ্বারা পূর্ব্ব অর্থাৎ উত্তমবর্ণবিশিষ্ট মনুষ্য নিজাপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং সেই বর্ণে গণনীয় হয়।

সর্ব্বাগ্রে বর্ণভেদ কেবল বংশানুযায়ী না হইয়া কেবল গুণ ও কর্ম্মানুসারে হইত, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আরও উদাহৃত হইতে পারে। শুক্ল যজুর্ব্বেদের ষোড়শ অধ্যায়ে নানা প্রকারের বৃত্তির কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু ঐ সকল বৃত্তি অবলম্বনকারীগণ তখনও যে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হয় নাই, তাহা অধ্যায়দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হইয়া থাকে। সূত্রধর, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, রজক, ক্ষৌরকার প্রভৃতি নানারূপ বৃত্তির কথা লেখা আছে সত্য, কিন্তু তাহারা যে স্বতন্ত্র বর্ণ ছিল, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শত পথ ব্রাহ্মণে আছে;—বিদেহ-রাজ জনক যাজ্ঞবল্ক্যের বরপ্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে;—ইলুষের পুত্র কবশকে দাসীপুত্র, অব্রাহ্মণ প্রভৃতি বলিয়া অপরাপর ঋষিগণ কোন যজ্ঞীয় সভা হইতে বিতাড়িত করেন। কিন্তু কবশের সহিত দেবগণের সদ্ভাব থাকায় তিনি পুনরায় ঋষিসমাজভুক্ত হয়েন। ছান্দোগ্য উপনিষদে যে সত্যকাম-জাবাল-সংবাদ আছে, তদ্দৃষ্টে বুঝা যায়, যে সত্যকাম অজ্ঞাত কুলোৎপন্ন দাসীপুত্র হইলেও গৌতম তাহার সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ্যে দীক্ষিত করিয়া বেদের উপদেশ দিয়াছিলেন। 'শূদ্রকে বেদের উপদেশ প্রদান' এরূপ আখ্যায়িকা আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে পাইয়া থাকি।

গুণ ও কর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষক্রমে যে বর্ণভেদ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত শ্লোক গুলিও প্রমাণস্বরূপে উদাহৃত হইতে পারে।

"সত্যং দানং ক্ষমাশীল মানৃশংস্যন্তপো ঘৃণা।
দৃশ্যতে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥"

সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, সারল্য, তপস্যা এবং করুণা যাঁহাতে দৃষ্ট হয়, হে নাগেন্দ্র! সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।

"জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায় নিরতঃ শুচিঃ।
কাম ক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"
(মহাভারত)

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়ে রত, শুচি, এবং যে ব্যক্তি কাম ও ক্রোধকে বশে রাখিয়াছে, তাহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

"যস্যচাত্ম সমোলোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্ব ধর্ম্মেষু চ রতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

যে ধর্ম্মজ্ঞ এবং প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি সকল লোককে আত্মতুল্য অবলোকন করেন এবং যিনি সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকেন, তাঁহাকে দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

"ন হায়নৈ র্ন পলিতৈ র্ন বিত্তেন নচ বন্ধুভিঃ।
ঋষয় শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনুচানঃ সনোমহান্॥"
(মনুঃ।)

অনেক বয়স হইলে বা কেশ পক্ক হইলে বা অনেক ধন ও বন্ধু থাকিলে মহত্ত্ব হয় না। ঋষিরা এই নিয়ম করিয়াছিলেন, যে আমাদের মধ্যে যিনি সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

"নতেন বৃদ্ধো ভবতি যে নাস্য পলিতং শিরঃ।
যোবৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥"

শুক্ল কেশযুক্ত মস্তক হইলেই বৃদ্ধ হয় না, যুবা যদি বিদ্বান হয়েন, তাঁহাকেই দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন।

পুরাকালে যে কেবল ব্রাহ্মণবীর্য্যে জন্মগ্রহণ করিলেই লোকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাদৃত হইতেন, তাহা নহে। পরন্ত গুণানুসারে ব্রাহ্মণের আদর ছিল।

ঋক্‌বেদ সংহিতায় আর্য্য ও অনার্য্য এই দুইটী জাতি মাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। অনার্য্যের পরিচয়স্থলে তাহারা দস্যু বা দাস ইত্যাদি ঘৃণাজনক বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। দস্যু শব্দের এখন প্রচলিত অর্থ ডাকাইত—